সর্বগ্রাসী বন্যা ও দুঃখিনী বাংলাদেশ

সৈয়দ মামুনূর রশীদ

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে শোন শোন পিতা / কহো কানে কানে শুনাও প্রানে প্রনে মঙ্গলবারতা / ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে সদাই ভাবনা / যা কিছু পায় হারায়ে যায় না মানে শান্তনা। সুঃখ আসে দিশে দিশে বেড়ায় কাতরে / মরিচিকা ধরিতে চায় এই মরু প্রান্তরে।

ত্রাণকেন্দ্রে একমুঠো ভাত কিংবা একটুকরো রুটির জন্য ক্ষুধার মন্থন সহ্য করে মানেবতর জীবনের অধিকারী মায়ের আঁচল ধরে বিমর্ষ বদনে সারাদিন দাঁড়িয়ে ছিলো গুড্ডুমিয়া। ত্রাণদাতাদের অপ্রতুল ত্রানে গুড্ডুমিয়ার মায়ের ফিরতে হলো খালিহাতে, নয়নভরা জলে। গুড্ডুটা বড়ই আদরের। মায়ের বুক ছাড়া তার ঘুম আসেনা। খালিহাতে ফিরতে ফিরতে মা তার আদরের সন্তানটির ক্ষুধা-ক্রন্দনের শান্ত্বনা দিচ্ছেন আর কাঁদছেন, চল বাবা! তোরে আমার কলিজাটা রেঁধে খাওয়াবো। এমনি দৃশ্য আজ আমার স্বদেশ চিরদুঃখিনী বন্যাক্রান্ত ভাটি অঞ্চল বাংলাদেশের। স্বামীহারা, ভিঠেহারা, কুলহারা মা'টির নাম ছিলো দিলরুবা। জাত বিচারে এই রমণী ছিলো বেদেনী, নৌকাবাসী, নদীবাসী সর্বোপরি জলবাসী। আচমকা তার থৈ থৈ যৌবনে আসে প্রেম। প্রেমিকবর কিন্তু জলবাসী নয়। ডাঙার ছেলে, গৃহস্থ। উত্তাল যৌবনা দিলরুবা স্বপ্ন দেখলো, গড়লো বসতি। মাত্র পৌনে দুই বছরের মাথায় প্রেমিকবর বিয়ে বসে অন্য নারীর সাথে, যার আছে জাত-কুল। বেদেনী দিলরুবা আর বিয়ে বসেনি। শুধু "মা" হিসেবে বেঁচে থাকাই তার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অত:পর স্বামী ত্যাগ করে সে বসতি গড়ে নদীর পাড়ে। গুড্ডু ছাড়া তার আর কেউই নেই। বেঁচে থাকার এই অবুঝ অবলম্বনটি যখন ক্ষুধার তাড়নায় কাতরাচ্ছে তখন মা দিলরুবার হৃদয়ের কথা কী হতে পারে তা পাঠকেরাই বুঝবেন। ত্রাণশেষে পত্রিকায় সংবাদ হলো দেড় হাজার দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন "ক" অথবা "খ"। "ক" কিংবা "খ" হয়তো দিয়েছেনও তাই। সংবাদদাতারও দায়িত্ব পরিসংখ্যন বিচার করা। কতজন বন্যা দুর্গত মানুষের মাঝে কতজন ত্রাণ পেলো। পরিসংখ্যন থেকে ঝরে পড়া দিলরুবার ইতিহাস দেখার সময় কই। হাজার হাজার অনাহারী মানুষের মাঝে ছোট্ট গুড্ডুর বেদনা, ক্ষুধার যন্ত্রণা বুঝতে না পারা কারো দোষও নয়।

এই উপমহাদেশের মানবতাবাদী সংগীত শিল্পী সুরেলা কন্ঠে গেয়েছিলেন "মানুষ মানুষের জন্য"। এই প্রবাদটি অবশ্য মানব সভ্যতার শুরু থেকেই সত্য বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। সেই আদিম যুগে মানুষ যখন প্রস্তর যুগে বসবাস করত তখন থেকে শুরু করে আজকের একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগেও বিপদে আপদে মানুষই মানুষের পাশে এসে দাড়াচ্ছে। আর এই বিষয়টি আমরা খুব বেশী করে অনুভব করি যখন আমাদের এই ছোট ব-দ্বীপের মানুষগুলো ভয়াবহ কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। ১৯৭০ সাল থেকে শুরু করে সম্প্রতি জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে যে ভয়াবহ বন্যা শুরু হয়েছে তাতে তাতে লাখ লাখ পরিবার হয়ে পড়েছে আশ্রয়হীন, বেচে থাকার জন্য নূন্যতম খাদ্য ও পানীয় জলের তীব্র সংকটে পড়ে ইতিমধ্যে ৩১৫ জন মানব সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর সংখ্যা ধীরে ধীরে আরো বাড়বে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। সরকারী বেসরকারী হিসেব মতে দেশের ৪৭ টি জেলা, ২৬০ টি উপজেলা, ১ হাজার ৬০৭ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা বন্যা কবলিত হয়েছে। প্রায় ১০ লাখ ঘরবাড়ী আংশিক ও ১ লাখ ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। সারা দেশের ১ কোটি মানুষ সরাসরিভাবে এখন বন্যাকবলিত। বন্যায় ইতিমধ্যেই গবাদি পশু, হাঁস, মুরগী ও মৎস্য খামারসহ গ্রামীন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম আয়ের পথ ব্যাপক ভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আধা পাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রায় ৩ লাখ একর জমির আউশ ধান। পানির নিচে তলিয়ে গেছে আট লাখ একর আমন ও ৫ লাখ একর সবজির জমি। জনপদের পর জনপদ বিলীন হয়ে যাচ্ছে বন্যার পানির করালগ্রাসে। চারদিকে শুধু হাহাকার, বন্যাকবলিত মানুষ খেয়ে না খেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। এমনি একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সরকার ঘোষণা করে শুধু মাত্র সরকারের পক্ষে এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ঠেকানো সম্ভব নয়।

প্রয়োজন সর্বসাধারণের সহযোগীতা। "মানুষ মানুষের জন্য" এই উপলব্ধি বোধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সবাই চেষ্টা করছে বন্যা কবলিত এই অসহায় মানুষ গুলোর পাশে দাড়ানোর। অতীতে যতবার এ জাতীয় দূর্যোগ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে প্রতিবারই দেশের শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত তরুণ সম্প্রদায়, ছাত্র সমাজ, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী, সরকারী-বেসরকারী, সেনাবাহিনী সহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিপন্ন মানবতার দিকে হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্য সর্বসাধারণের অংশগ্রহনের পরও বন্যা মোকাবেলায় আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর নয়। স্বাধীনতাউত্তোর কাল থেকে যখনই বন্যারকরাল গ্রাস আমাদের ছোবল হেনেছে তখনই আমরা ঝাপিয়ে পড়েছি কিন্তু বন্যা প্রতিরোধে কিংবা বন্যা মোকাবেলায় সমন্বিত পদক্ষেপ কখনোই সেভাবে গ্রহন করা হয়নি। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা সকলে একযোগে ভুলে যাই বন্যার্ত মানুষগুলোর কথা। প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাথে সাথে আমারা ও আমাদের চোখ ফিরিয়ে নিই অন্যদিকে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর গৃহহীন মানুষগুলো কিভাবে দিনাতিপাত করছে তার কোন খবর আমরা রাখিনা এমনকি পরবর্তীতে এই ধরণের বন্যা কিভাবে রোধ ও মোকাবেলা করা যায় সরকারী ও বেসরকারী কোন পক্ষ থেকেই সমন্বিত কোন কার্যক্রম লক্ষ করা যায়না। প্রতিবারের বন্যায় একই এলাকার মানুষগুলোই গৃহহীন হয়, একই এলাকার মানুষ গুলোই মারা যায়। কিন্তু কেন? স্বাধীনতার ৩৬ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও আমরা জাতীয় ভাবে বন্যা মোকাবেলায় কোন নীতিমালা ঘোষণা করতে পারিনি। আমরা পারিনি বন্যা কবলিত মানুষগুলোর জন্য কোন রোড ম্যাপ কর্মসূচী ঘোষণা করতে। বন্যা আসবে বন্যা যাবে এটি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পরিবেশবিদ আইনুননিশাত সহ অন্যান্য পরিবেশবিদেরা ভবিষ্যতে আরো বড় ধরণের বন্যার আশংকা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একটু সচেষ্ট হলেই আমরা পারি এই বানভাসী মানুষগুলোর হাহাকার কমাতে। বার বার এই ধরণের পরিস্থিতি মোকাবেলার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা সত্বেও এখনও বন্যা এলে বন্যা কবলিত মানুষগুলোকে নিজের ভিটা ছেড়ে চলে যেতে হয় নিরাপদ আশ্রয়ে। সেই আশ্রয়খানায় আবার পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান হয়না। আদম সন্তান ও পশুকুল এক সাথে একই জায়গায় গাদাগাদি করে কোন রকম বেচে থাকে। আশ্রয়খানার বানভাসী মানুষগুলোকে বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদেরকে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি দাড়িয়ে থাকতে হয় এক মুঠো রিলিফের আশায়। এই রিলিফের লাইনে আবার পুরুষদের খুব একটা দেখা যায়না। আমাদের গ্রামীন নারীরাই এখনো বন্যা মোকাবেলার জন্য আগ থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। মুষ্টি চাল জমানো, দিয়াশলই ও শুকনো চাল মজুত করে রাখা, ডুবে যাওয়া নলকুপ থেকে বিশেষায়িত পদ্ধতিতে খাওয়ার পানি সংগ্রহ করা, বন্যায় সাপের কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাচার কোনে হলদে পোড়া রেখে দেওয়া সহ অনেক রকমের জীবন রক্ষাকারী পদ্ধতি নারীরাই উদ্ভাবন করেছে। আবার এই নারীদেরকেই আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে মানুষরুপী কতগুলো নরপশুর লালসার শিকার হতে হয়। বন্যা নেমে যাওয়ার পর শুরু হয় নারী পুরুষ সকলের জন্য আরেক সংগ্রাম। কারণ যতদিন আশ্রয় কেন্দ্রে থাকে ততদিন দু এক মুঠো রিলিফ পেলেও আশ্রয় কেন্দ্র ত্যাগের সাথে সাথে সেটুকু ও বন্ধ হয়ে যায়। "কাজের অভাব, খাদ্যের অভাব, নতুন করে বাড়ী ঘর তৈরী করা" এযেন নতুন জেগে উঠা চরের মাঝে, নতুন করে বসতি স্থাপন করা। দাদন ব্যবসায়ীদের কাছে হাত পাতা, সামান্য টাকার জন্য নিজের বাপদাদার সম্পত্তি অন্যের নামে লিখে দেওয়া। এই মনুষ্য আক্রমনের সাথে আবার মড়ার উপর খড়ার গায়ের মত আছে রোগব্যাধির আক্রমন। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে ডায়রিয়া, কলেরা ও চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগব্যাধি মানুষের জীবনকে বিষিয়ে তুলে। এত কিছুর পরেও আমরা নীরব থাকি। রবীন্দ্রনাথের ভাষার "সকল রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি"। কিন্তু এভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবেনা। আমি অর্থনীতির ছাত্রী নই। এই বন্যার কারনে দেশের অর্থনীতি কতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাও খুব একটা বুঝিনা। তবে বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী হিসাবে আমি এতটুকু বুঝি আমার এই বাংলা মাকে রক্ষা করতে হলে এই বানভাসী মানুষগুলোকে রক্ষা করতে হবে। এদের রক্ষার জন্য মাচা ঘরের মত বাড়ী ঘর তৈরী করে দিতে হবে, পরিকল্পিতভাবে বাঁধ নির্মান করতে হবে, বন্যার পানি দ্রুত নিস্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে, বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর নতুন করে চাষাবাদের জন্য বীজ ও সার সরবরাহ করতে হবে এবং বিনা সুদে ঋণ প্রদান করতে হবে।

বন্যা পরবর্তী সময়ে ডায়রিয়া ও চর্মরোগ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ঔষধ সরবরাহ করতে হবে। বন্যাকালীন সময়ে শুধু মাত্র দুমুঠো রিলিফ এবং বন্যা পরবর্তী সময়ে একটা দুটো বাধ দিয়ে সরকারের দায়িত্ব শেষ করলে চলবেনা। এটা আজ প্রমানিত সত্য। এই বানভাসী মানুষগুলোই আমাদেরকে সারাবৎসর খাদ্যের যোগান দেয়। আমাদের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। আবার শীতে, গ্রীস্মে, বন্যায় এই মানুষগুলোকেই প্রান দিতে হয়। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আনিসুল হকের ভাষায় "এরা শীতে ও মরেনা. গরমেও মরেনা, বন্যায় ও মরেনা বস্তুত এরা মরে দারিদ্রে"। তাই এই মানুষগুলোকে বাঁচাতে হলে সর্বপ্রথম এদের দারিদ্র দুর কর‍ার স্থায়ী উদ্যোগ নিতে হবে।

সৈয়দ মামুনুর রশীদ, চট্টগ্রাম,(লেখক, কবি, উন্নয়নকর্মী), ৩০/০৮/২০০৭
ইমেইল #
totalmamun@yahoo.com,
totalmamun@gmail.com,
sangu_ctg@yahoo.com

লেখকের অন্যান্য লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন